জাফরান রঙের আলো

শব্দ সময় ইমেজ

অর্ণব সাহা

লিইবার ফিয়েরা

সূ চি

কথামুখ ৭
অনুন্নয়নের স্মৃতি ১১
এল পার্টিডো কমিউনিস্তা ২১
নির্বাসন, অনুপস্থিতি ৩১
রূপকথার নিষ্ঠুরতা ৪২
বিষুব অরণ্যের দিন ৫৩
আমিষাশী তরবার ৬৬
বুনো স্ট্রবেরির গন্ধ ৭৭
অর্ফিউসের গান ৮৫
জনৈক বহিরাগত ৯৫
নেই-দেশের কবিতা ১০৬
কলকাতা কোলাজ ১১৪
তিন সৈনিক ১২২
ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে ১৩২
পিঠফেরানো ময়ূর ১৪০
অসম্পূর্ণ জলরেখা ১৪৮
গুহাহিত সংলাপ ১৫৭
অসম্ভবের কবিয়াল ১৬৭
নৈশ বিদ্যালয় ১৭৮
জাফরান-রঙের আলো ১৮৪
সে আর সপ্তমী তিথি: চাঁদ ১৯২

কথামুখ

'জাফরান রঙের আলো: শব্দ সময় ছবি' আসলে আমার আত্মজীবনীর অংশ। যে আমি-টা দৈনন্দিন পেশাগত জীবনে নানা কাজের মধ্যে মিশে থাকে, যে বিবিধ জাগতিক ও সামাজিক টানাপোড়েনে বিভিন্নভাবে ধ্বস্ত হয় প্রতিদিন, সেই 'আমি' নয়, এ আমার অন্তর্জীবনের ইতিহাস, যে আখ্যানের সঙ্গে আমি জড়িয়ে আছি সেই কিশোরবেলা থেকে। আমাদের দমদমের সাবেকি বাড়ি, সেখানকার আধা-শহুরে, প্রান্তিক উত্তর কলকাতার জীবন আমার অস্তিত্বের পরতে পরতে আজও মিশে আছে। ওই পাড়ার দেওয়ালে দেওয়ালে আমার শৈশবেও, প্রায় দুই দশক পেরিয়েও, কোনও কোনও বাড়ির দেওয়ালে আঁকা ছিল কমরেড মাও-এর মুখ। পিছিয়ে পড়া, দক্ষিণ কলকাতার সচ্ছল নাগরিকতার চেয়ে ঢের দূরে থাকা এক জনপদ, যেখানকার মানুষজনেরা আজও কী এক আশ্চর্য মায়ায় জড়িয়ে রেখেছে আমাকে! সেই নেপথ্য জীবনের অপরূপ বর্ণালিই গড়ে তুলেছে আমার লেখক-জীবনকে। এযাবৎ আমার লেখা সমস্ত কবিতা-গদ্য-গল্প-উপন্যাসে মিশে আছে আমার সেই নস্টালজিয়ার অসুখ, যা বোধহয় এ জীবনে আর পিছু ছাড়বে না আমার। সেপিয়া টোনে আঁকা সেই স্মৃতির চাদর মিশে আছে এই বইয়ের প্রায় প্রত্যেকটা লেখায়।

এই গদ্যগুলোর চালচিত্র হিসেবে রয়েছে আবহমান বাংলা কবিতা। মূলত আধুনিক কালপর্বের বাংলা কবিতা, সেই সঙ্গে

এসেছে পাবলো নেরুদা, র‍্যাঁবো, মিলান কুন্দেরা, আন্দ্রেই তারকোভস্কি, কুরোসাওয়া, চে গেভারা, জীবনানন্দ দাশ, বার্গম্যান, জাঁ ককতো, টোমাস আলিয়া, ফেদরিকো গার্সিয়া লোরকা থেকে মাওবাদী বস্তারের পটভূমি, কবীর সুমন হয়ে আরব বসন্তের ফেনিল আগুনের উচ্ছ্বাস ও আরও বহু কিছু। অর্থাৎ কবিতা-রাজনীতি-সিনেমা-ছবি মিশিয়ে এক অনুপম মিশ্র কোলাজ এই লেখাগুলি। আমাদের সবচেয়ে বড় নেপথ্যের আর্কাইভ স্মৃতি। কিন্তু স্মৃতিও ভাষা দিয়ে গড়ে তোলা শব্দসমষ্টি। তারও ব্যাকরণ কৌমুদি আছে, ণ-ত্ব য-ত্ব কানুন আছে। ফলত, রয়েছে বিশ্বাসঘাতকতাও। তাই, আমি মনে করি, স্মৃতিকেও হত্যা করা দরকার। এমনভাবে, যাতে রক্তপাতের শেষতম চিহ্নটুকুও অস্ত্রের শরীর থেকে মুছে ফেলা যায়। আমাদের অস্তিত্ব প্রথম থেকেই ঠাঁইনাড়া, বাস্তুহীন। আমরা সেই ডায়াসপোরিক কণ্ঠস্বরের পিছু নিতে চাই, যা আসলে কবেই ভ্যানিস হয়ে গেছে। 'উন্নয়ন' শব্দটাই সন্দেহজনক। আমরা আন্ডারডেভেলপমেন্টের সন্তান। আমাদের সর্বাঙ্গে অনুন্নয়নের স্বেদরক্ত। চেনা কবিতার ছেঁড়াখোঁড়া পঙ্‌ক্তি, টুকরো রাজনৈতিক ঘটনাপরম্পরায়, কম্পিউটার স্ক্রিনে দেখা ছায়াছবির স্বতশ্চল মুভমেন্টে মিশে রয়েছে আমাদের সেই পিছুটান। না-হয়ে ওঠার আখ্যান। এই সংস্করণের প্রত্যেকটা লেখায় জড়িয়ে রয়েছে সেই রক্তপাতের চিহ্ন। স্মৃতির ভিতর ঢুকে গিয়ে স্মৃতিকে ছাপিয়ে তোলা এই বইয়ের লেখাগুলো আসলে আমাদের বেঁচে থাকার সঙ্গে ক্ষমতার অন্তর্লীন সংলাপ, এক তীব্র মাদকতার দিনলিপি।

ধন্যবাদ প্রকাশক 'লিবের ফিয়েরা' -কে। তাঁরা এগিয়ে এসেছেন এই একান্ত নিজস্ব বর্ণমালার পাঠোদ্ধার করার অক্ষম চেষ্টাগুলোকে দুই মলাটের মধ্যে ধরতে। বস্তুত ক্ষমতার সঙ্গে লেখকের আজকের

সম্পর্ক আড়াআড়ি এবং কিছুটা আপসের। এই একান্ত ব্যক্তিগত কথনের টুকরোগুলো পাঠকের ভালো লাগলেই আমার কাজের সার্থকতা। আমি জানি না সর্বার্থে মার্জিনাল একজন লেখকের এই নিজস্ব বয়ান কোনও পাঠককে আদৌ স্পর্শ করবে কি না। কিন্তু এটা নিশ্চিত, এইসব লেখার কোনও না কোনও খণ্ডাংশে পাঠক খুঁজে পাবেন নিজেকে। সম্ভবত সেখানেই এই বইয়ের সার্থকতা। কারণ আমরা আসলে সকলেই সেই দেশেই পৌঁছতে চাই যে দেশের কোনও অস্তিত্ব নেই। যে দেশ আসলে সেই কোন অতীতেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। রেখে গেছে কিছু প্রত্নছাপ, কয়েকটা আবছা অক্ষরের সমষ্টি।

শুভেচ্ছাসহ,

ফেব্রুয়ারি ২০২২, কলকাতা

অর্ণব সাহা

অনুন্নয়নের স্মৃতি

স্মৃতির চেয়েও খতরনাক বিস্মৃতি। স্মৃতি ক্রিয়েটিভ। তার ভাণ্ডারে মুখ ডোবালে মেহগনি কাঠের গন্ধ। ভাঁজ-পড়ে যাওয়া স্বপ্নের বলিরেখা। অথচ বিস্মৃতি ধ্বংসাত্মক। সে এক গভীর অবদমনের বিষাক্ত সন্তান। বোমারু হানায় বিধ্বস্ত নড়বড়ে কাঠের সেতু, যার উপর পা রাখা সবসময়ই বিপজ্জনক।

স্মৃতি আশ্রয় দেয়। বিস্মৃতি তাড়া করে ফেরে... দু'মাথাওয়ালা এই সাপের পিছল শরীরে পা রেখেই আমি ফিরে এলাম আমার কৈশোরের পাড়ায়...

ঠিকানা একটা আছে বটে। এবং কী আশ্চর্য! তারও পিন কোড কলকাতা। অথচ এই অন্ধকার, আগোছালো, পিছিয়ে থাকা জনপদ কিছুতেই কলকাতা নয়। দমদমের এই এলাকা যেন সেই বেপাড়ার গরিব আত্মীয়, যে বছরের পর বছর মুখ বুজে উদাসীন দেখে যায় পড়শি নাগরিকতার বাড়বৃদ্ধি। অন্যকে বদলে যেতে দেখে সে, অথচ নিজে বদলায় না। অনড়, স্থানু অস্তিত্ব তার... সময় যেখানে স্তব্ধ হয়ে আছে...

মেমোরিজ অফ আন্ডারডেভেলপমেন্ট...

দেড় দশক বাদেও প্রায় একই রকম রয়েছে সবকিছুই। রেলব্রিজের নীচে খানায় খন্দে ভরা রাস্তা। অত্যাবশ্যক যানজট ঠেলে রিক্সাস্ট্যান্ডে পৌঁছানো। তার চেয়ে ঢের ভালো পায়ে হাঁটা রাস্তায় আশৈশব চেনা বাড়িগুলোকে পরখ করা। তাদের

রং-ওঠা, হাড় বের করা মায়াময় শরীরে শেষবিকেলের আলো। মেছেতা-পড়া চায়ের দোকানগুলোয় কম-পাওয়ারের বাল্ব জ্বলে উঠবে এখনই। বাঁ-হাতে কমল ডাক্তারের নড়বড়ে হোমিওপ্যাথি ক্লিনিক, ঘুপচি টেলারিং শপ, হরি সাহা-র মাসকাবারি দোকান, পল্লিমঙ্গল সমিতি, মৈত্রী পাঠাগার, পাগলিপুকুর পেরিয়ে একচক্ষু দৈত্যের মতো একটা বিশাল বাড়ি, প্রায় বেঢপ হাভেলিই বলা যায়, ঠাকুরদা বানিয়েছিলেন স্বাধীনতা, থুড়ি দেশভাগের কয়েকবছর পরেই। যে বাড়ি শেষবারের মতো রং করা হয়েছিল ৮০-র দশকের মাঝামাঝি। যার ভিতর উঠোন এতটাই নীচু যে সারাবছর অল্পবিস্তর জল জমে থাকে। একতলার ছ'টা ঘরে জন্মাবধি ভাড়াটেদের দেখে আসছি আমি, অধিকাংশই ওপার বাংলা থেকে আসা নিম্নবিত্ত পরিবার, বাকি দুটো ঘরে চাকুরিরত, চাকরিপ্রার্থী অল্পবয়সিদের মেস। গেটের পাশে সাদা পাথরের ফলকে লেখা— 'জ্যোৎস্নালয়', আমার ঠাকুমার নামেই তৈরি এই বাড়ি।

একতলার অন্ধকার মেসবাড়ির ঘরগুলোয় সারাদিন তেমন আলো ঢুকত না। দড়িতে ঝোলানো থাকত ময়লা, বাসি কাপড়-জামা, গামছা। ওই মেসেই থাকত এক তরুণ কবি। তার নাম আমি জানতাম তাপসকাকু। যাদবপুর নাইটে পড়ত সে, বাংলা নিয়ে। প্রায় নাম-না-জানা হঠাৎ বেরোনো পত্র-পত্রিকায় ফিচার লিখত মাঝেমধ্যে। ১৯৯০ সাল নাগাদ আনন্দবাজারে একটা ছোট্ট রিপোর্ট লিখেছিল তাপসকাকু। তার কাছ থেকে যে সামান্য কয়েকটা কবিতার বই জোগাড় করেছিলাম আমি, তার ভিতর একটির নাম 'বারো নম্বর বাড়ি'। রবীন সুরের লেখা। স্মৃতির ভিতর জারিত হয় যে সত্তা, এই বইয়ের একাধিক লেখায় যেন সেই চৈতন্যের পিছুটান:

‘পুরোনো বাড়ির দুর্দশা ক্রমশই বেড়ে যায়
কড়িকাঠের ফাঁকফোকরে চড়াই পাখির বাসা
সারাদিন চ্যাঁচামেচি
খড়কুটোর জঙ্গল
কাটা ডিমের ন্যালসানি...

একটু ঝড়েই
দেওয়ালের পলেস্তারা ঝুরঝুর
এক পশলা বৃষ্টির আনন্দ
ফুটো ছাদের আতঙ্ক বাড়িয়ে
ছড়ছড়ে জলের আক্রমণে
গেরস্তকে নাস্তানাবুদ করে তোলে
ঘরের সমস্ত ঢেও ডাকনা ওলোট-পালোট
বন্যার কথা মনে করিয়ে দেয়

বারান্দার কার্নিশে
সারাদিন একটা ঘুঘু ডাকে
বাড়ির বৃদ্ধা শুধু আরও কপাল কোঁচকায়
‘আ মরণ, তাড়া ওটাকে’
ছাদের নর্দমার কোল ঘেঁষে
এক তরুণ অশ্বত্থ তার শেকড় ছড়াচ্ছে

এই প্রাচীনতা ছেড়ে
কোথায় যাব
না এটাকেই মেরামত করে নতুন করে নেব?’

স্বপ্ন লোক-লৌকিকতার ধার ধারে না। আর স্মৃতি স্বপ্নেরই সহোদর। আজ মনে পড়া অসম্ভব কোন প্রায় না-ঘুমানো শীতের রাত্রে জেগে উঠে পিছনদিকের মাঠে দেখতে পেয়েছিলাম জ্যান্ত সিন্ধুঘোটক। বহুদূরের পোড়ো বাড়ির চিলেকোঠা ঘরটাকে ঝাপসা বৃষ্টির ভিতর পরিত্যক্ত সেলাইমেশিন মনে হত। উত্তরের জানলা দিয়ে দেখতে পাওয়া বিশালাকৃতি দুটো চিমনি, ৮০-র দশকের শেষ থেকে যারা আর কালো ধোঁয়া বের করবে না। অথচ ধূসরতম স্মৃতিতে জেগে ওঠা '৭৮-এর বন্যা, দোতলার বারান্দা থেকে দেখতে পাওয়া আঁকাবাঁকা বাণ মাছ, কলার খোল দিয়ে বানানো ভেলায় চড়ে ভেসে যাচ্ছে পিছনের বস্তির ছেলেরা। আর দূর থেকে দেখা দোলের প্রাক্‌সন্ধ্যায় ন্যাড়াপোড়া, দোতলা-সমান আগুনের উদ্‌গার। এতদিন বাদে যদি সেইসব ভাঙাচোরা দৃশ্যকল্পের দোরগোড়ায় পৌঁছই তবে কুয়াশায় ঠোক্কর খেয়ে অচেতন হয়ে যাবার উপক্রম ঘটবে। নিজেরই তৈরি করা জটিল গোলকধাঁধার বুনোট ছিঁড়ে পৌঁছতে পারব না শিকড়ের কাছাকাছি। এতক্ষণে স্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছি রঞ্জিতের চায়ের দোকানে। উল্টোদিকের জলাজমিটা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা দেখেছি বরাবর। সামনেই বিশ্বাসবাড়ি। ওদের বড় মেয়েটা পাগল হয়ে গিয়েছিল। একলা ছাদে উঠে নিজের জটপড়া চুল থেকে উকুন বাছত। আশ্চর্য। এইসব ছবি তো আমি ভুলতেই চাইতাম এতদিন। ক্রুশবিদ্ধ অক্ষর, মৃত হরফের ডালপালা বেয়ে এ আমি কোথায় চলেছি?

'ফিরছিলাম যখন সরু গলিতে, অন্ধকার তখন জাঁকিয়ে বসেছে।

আমি ভাবছিলাম সব মুখই তো এখনও মুখোশ হয়ে যায়নি
আর মনে পড়ে যেতে পারে দু-এক লাইন গান

'কাল রাত্রিবেলার স্বপ্নে দু' একটা সাদা পালক ছিল। দু' একটা নীল পালক।
শ্যাওলাঢাকা বাড়ি।
পাশের পাশেরটায় পরিমলবাবু থাকতেন।
সেও প্রায় শ্যাওলা।
যেসব পাতায় আঁচড় কেটেছিলাম
লাফঝাঁপ দিয়েছিলাম দিগন্তের সেসব উঠোনে
চুমো দিয়েছিলাম সেসব চোখের পাতাগুলোয়

হাতবোমা নয় সেসব। আজকের দিনের মতো শিকারীর টুপিও নয়।'

আমি তবে এক স্মৃতিশিকারী? সতর্ক পদক্ষেপে যে তাড়া করে নিজেরই অতীতকে? যে অতীত ধ্বস্ত, যে স্মৃতি অনন্নুয়নের আর পিছুটানের, ক্ষয় আর ব্যর্থতার? প্রতিটি পরিবারের মধ্যেই থাকে কিছু অন্ধকার দিক, যার সবটুকু বোঝা যায় না, কেবল ক্ষত-বিক্ষত হওয়া যায়, সঠিক মুহূর্তটির জন্য অপেক্ষা করা যায়, যাতে সেই আঁধারগর্ভ থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসা যায়, আরও তীব্র বিস্মৃতির ভিতর ফিরিয়ে নেওয়া যায় নিজেকে। তারপর এক আকস্মিক মাঝরাতে চেতনার দু' একটা ক্ষীণ সুতোর টানে ছটফট করে ওঠে আত্মা, মনে হয় কী যেন হারিয়ে গেছে জীবন থেকে, ছিন্ন, উৎপাটিত শিকড়ের অনুপস্থিতি ভিত অবধি টলিয়ে